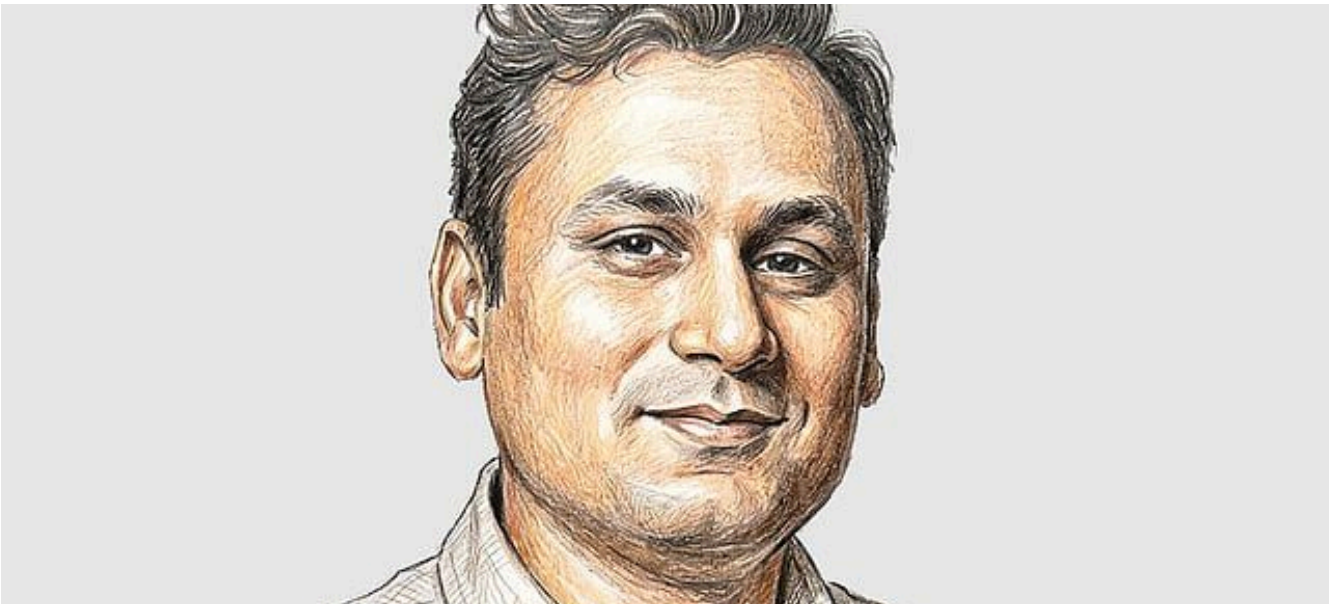
Prothom Alo · 2026-11-09 · Archived copy for hoques.com

ডিগ্রি আছে, চাকরি নেই? ভয় পেয়ো না

এহসান হক



২০০৪ সাল। যুক্তরাষ্ট্রের একটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সবে কম্পিউটার প্রকৌশলে স্নাতক হয়েছি। মাথায় অনেক স্বপ্ন: ভালো একটা চাকরি হবে, নিজের পায়ে দাঁড়াব, শুরু করব জীবনের বাকি পরিকল্পনা। স্নাতক হওয়ার কয়েক মাস আগে থেকেই বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে রেজুমে পাঠাতে শুরু করলাম। একের পর এক আবেদন করেও চাকরির কোনো খবর পেলাম না।

আমি তখন যুক্তরাষ্ট্রে পড়তে আসা একজন আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পড়াশোনার সঙ্গে সম্পর্কিত চাকরি না পেলে খালি হাতে দেশে ফিরে যেতে হবে। তারও আগে আরেক চিন্তা। বাসাভাড়া দেব কী করে? পেটে ভাত জুটবে কোথা থেকে?

খরচ চালাতে অগত্যা একটি পিৎজার দোকানে কাজ নিলাম। সারাদিন পিৎজা বানাই, বাসনকোসন ধুই, টেবিল মুছি। সৎভাবে রোজগার করার মধ্যে অসম্মানের কিছু নেই। কিন্তু মাঝেমধ্যে ভাবতাম, এত পড়াশোনা করে লাভটা কী হলো?

শেষ পর্যন্ত ভাবলাম, চাকরি যখন হচ্ছে না, আবার পড়াশোনায় ফিরি। জিআরই পরীক্ষা দিয়ে স্নাতকোত্তরে ভর্তির আবেদন করলাম। প্রতিদিন ই–মেইলের ইনবক্স খুলে বসে থাকতাম। এই অনিশ্চয়তা থেকে কি কখনো মুক্তি পাব?

২২ বছর পর, ২০২৬ সালে এসে বাংলাদেশের চাকরিপ্রত্যাশী তরুণদের কথা ভাবলে সেই দিনগুলোর কথা মনে পড়ে। আজ অনেকের ডিগ্রি আছে, কিন্তু চাকরি নেই। কারও পরিবার পড়াশোনার খরচ জোগাতে ঋণ করেছে, কেউ ছোট ভাইবোনের পড়াশোনার দায় কাঁধে নিয়েছে। এর মধ্যে আত্মীয়স্বজনের চিরচেনা প্রশ্ন: ‘কী খবর, চাকরি হলো?’ প্রশ্নটা যত সহজ, উত্তর দেওয়া তত কঠিন।

নিজের যোগ্যতা নিয়ে সংশয়, ভবিষ্যৎ নিয়ে দুশ্চিন্তা, আর চারপাশের সবাই এগিয়ে যাচ্ছে অথচ নিজে পিছিয়ে পড়ছি বলে মনে হওয়া—এই অনুভূতিগুলো আমার খুব চেনা।

> *নতুন প্রযুক্তি নিয়ে মানুষের এমন দুশ্চিন্তা আজকের নয়। আড়াই হাজার বছর আগে গ্রিক দার্শনিক প্লেটোর লেখায় সক্রেটিস আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন, মানুষ সবকিছু লিখে রাখতে শুরু করলে স্মৃতিশক্তির চর্চা কমে যাবে।*

আমরা বেকার তরুণদের খুব সহজে উপদেশ দিই: আরও পরিশ্রম করো, আরও দক্ষ হও। পরিশ্রম আর দক্ষতার অবশ্যই দরকার আছে। কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য প্রসঙ্গও বিবেচনায় আনতে হবে। বাংলাদেশের শ্রমশক্তি জরিপ ২০২৪ অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিধারীদের মধ্যে বেকারত্বের হার প্রায় সাড়ে ১৩ শতাংশ। এত তরুণ যখন চাকরি পাচ্ছে না, তখন প্রশ্ন উঠতেই পারে, সমস্যাটা কি শুধুই তাদের যোগ্যতা আর অভিজ্ঞতার অভাব? উচ্চশিক্ষার সুযোগ বাড়ছে, কিন্তু সেই অনুপাতে উপযুক্ত কাজের সুযোগ তৈরি হচ্ছে কি?

এর মধ্যে নতুন করে দুশ্চিন্তা বাড়িয়েছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই। আগে মানুষ যে প্রতিবেদন লিখত, কোড তৈরি করত, তথ্য বিশ্লেষণ করত, তার অনেকখানির প্রথম খসড়া এখন এআই এক মুহূর্তেই বানিয়ে ফেলছে। তাহলে এত দিন যা শিখলাম, তার দাম কি শূন্য হয়ে যাবে?

প্রশ্নটা অমূলক নয়। যুক্তরাষ্ট্রের স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকেরা দেখেছেন, এআইয়ের প্রভাব বেশি এমন পেশায় তরুণ কর্মীদের কর্মসংস্থান তুলনামূলকভাবে কমেছে। অবশ্য এর সবটুকুর জন্য শুধু এআইকে দায়ী করা যাবে না। তবে বিষয়টা ভাবার মতো। নতুনেরা সাধারণত ছোট ছোট কাজ করতে করতেই অভিজ্ঞতা অর্জন করে। সেই কাজগুলোই যদি এআই করে ফেলে, তাহলে নতুনেরা শিখবে কোথায়? আর অভিজ্ঞতা না থাকলে ভালো চাকরি পাবে কীভাবে? এ যেন এক দুষ্টচক্র।

> *নব্বইয়ের দশকে যখন সবাই ল্যান্ডফোন ব্যবহার করত, তখন পরিচিত কত মানুষের ফোন নম্বর আমাদের নখদর্পণে ছিল। মুঠোফোন আসার পর এখন নিজের পরিবারের সদস্যদের ফোন নম্বরও অনেকে স্মরণ করতে পারি না।*

নতুন প্রযুক্তি নিয়ে মানুষের এমন দুশ্চিন্তা আজকের নয়। আড়াই হাজার বছর আগে গ্রিক দার্শনিক প্লেটোর লেখায় সক্রেটিস আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন, মানুষ সবকিছু লিখে রাখতে শুরু করলে স্মৃতিশক্তির চর্চা কমে যাবে। কারণ, তখন আর নিজের মনে রাখার প্রয়োজন হবে না। মজার ব্যাপার হলো, সক্রেটিসের সেই আশঙ্কার কথা আজও আমরা জানতে পারছি; কারণ, প্লেটো তা লিখে রেখেছিলেন।

আরেকটা উদাহরণ দিই। নব্বইয়ের দশকে যখন সবাই ল্যান্ডফোন ব্যবহার করত, তখন পরিচিত কত মানুষের ফোন নম্বর আমাদের নখদর্পণে ছিল। মুঠোফোন আসার পর এখন নিজের পরিবারের সদস্যদের ফোন নম্বরও অনেকে স্মরণ করতে পারি না। কিন্তু তাই বলে কি আমাদের মনে রাখার ক্ষমতা কমে গেছে?

কিংবা জিপিএসের কথা ভাবুন। আগে অচেনা শহরে পথ খুঁজতে মানচিত্র দেখতে হতো, পথচারীকে জিজ্ঞাসা করতে হতো। এখন ফোনের নির্দেশ শুনেই গন্তব্যে পৌঁছে যাই। গবেষণায় এমন ইঙ্গিতও পাওয়া গেছে, অতিরিক্ত জিপিএস ব্যবহারের কারণে নিজের চেষ্টায় পথ খুঁজে নেওয়ার দক্ষতা কমে যেতে পারে।

অর্থাৎ প্রযুক্তি আমাদের জীবন সহজ করে, কিন্তু তার বিনিময়ে কিছু দক্ষতার চর্চাও কমে যায়। তাই বলে কি আমরা লেখালেখি, মুঠোফোন বা জিপিএস ব্যবহার বন্ধ করে দিয়েছি? দিইনি। বরং প্রযুক্তির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের অভ্যাস আর কাজের ধরন বদলেছে। এআইয়ের ক্ষেত্রেও বিষয়টাকে সেভাবে দেখা দরকার। যন্ত্র মানুষের কোন কাজগুলো নিয়ে নিচ্ছে, শুধু সেটা ভেবে ভয় পেলে চলবে না। বরং যন্ত্রের সাহায্যে মানুষ আগে যে কাজগুলো করতে পারত না, কিংবা করতে অনেক সময় লাগত, সেগুলো এখন কীভাবে করতে পারছে, সেটাও ভাবতে হবে।

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার ২০২৫ সালের বিশ্লেষণ বলছে, বিশ্বের প্রতি চারটি চাকরির প্রায় একটি এআইয়ের প্রভাবে বদলে যেতে পারে। তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে চাকরি পুরোপুরি হারিয়ে যাওয়ার চেয়ে কাজের ধরন পাল্টানোর সম্ভাবনাই বেশি। কিন্তু কাজের ধরন বদলাবে বললেই তো নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না। নতুন সুযোগ সবার কাছে সমানভাবে পৌঁছাবে, এমন নিশ্চয়তা কোথায়? যারা নতুন প্রযুক্তি শেখার সুযোগ পাবে, তারাই এগিয়ে যাবে। অন্যরা আরও পিছিয়ে পড়বে। তাই পরিবর্তনটা অস্বীকার না করে তার জন্য প্রস্তুত হওয়াই জরুরি।

আমি বহু বছর ধরে মানুষের সঙ্গে প্রযুক্তির সম্পর্ক নিয়ে গবেষণা করছি। ২০১১ সালে একটি সম্মেলনে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সম্ভাবনা নিয়ে বেশ উৎসাহের সঙ্গে বক্তৃতা দিয়েছিলাম। বক্তব্য শেষে একজন এসে নিজের সামাজিক যোগাযোগের অসুবিধার কথা জানালেন। তারপর প্রশ্ন করলেন, ‘বিজ্ঞান যদি মানুষের কাজে না আসে, তাহলে সেই বিজ্ঞান করে আমার কী লাভ?’ কথাটা আমাকে ভীষণভাবে নাড়া দিয়েছিল।

আমরা গবেষকেরা অনেক সময় নতুন প্রযুক্তি কতটা বুদ্ধিমান, কত দ্রুত কাজ করতে পারে, এসব নিয়ে ব্যস্ত থাকি। কিন্তু সেই মানুষটির প্রশ্ন আমাকে মনে করিয়ে দিয়েছিল, যন্ত্র কত বুদ্ধিমান হলো, তার চেয়েও জরুরি হলো, যন্ত্রটি কার উপকারে এল?

সেই অভিজ্ঞতা থেকে আজকের তরুণদেরও একটা কথা বলতে চাই। শুধু এআই দিয়ে সুন্দর উত্তর বানানো শিখলে চলবে না। কোন প্রশ্নটা করা উচিত, উত্তরের ভুল কোথায়, আর কার জীবনে সেই উত্তর কাজে লাগবে, এসবও বুঝতে হবে।

আগামী দিনের মূল্যবান দক্ষতা হয়তো শুধু উত্তর জানায় নয়, সঠিক প্রশ্ন করতে পারায়। এআই কোড লিখে দিলেই সফটওয়্যার নিরাপদ হয় না। কৃষকের জন্য পরামর্শ দিলেই সেটা বাংলাদেশের মাটি আর আবহাওয়ার উপযোগী হয় না। একজন রোগীর জন্য তথ্য সাজিয়ে দিলেই তা চিকিৎসকের বিচারবোধের বিকল্প হয় না। এগুলোর জন্য বিষয়জ্ঞান দরকার, মানুষের বাস্তবতা বোঝার ক্ষমতা দরকার। দরকার সহমর্মিতা, নৈতিকতা আর নিজের কাজের দায়িত্ব নেওয়ার মানসিকতা।

> *নিজের সামর্থ্য প্রমাণ করতে প্রথমেই বড় কোনো প্রতিষ্ঠানে চাকরি পাওয়া জরুরি নয়। ছোট পরিসরেও শুরু করা যায়।... সাক্ষাৎকারে শুধু ‘আমি পারি’ বলার বদলে ‘এই যে, আমি করে দেখিয়েছি’ বলতে পারবে। এই পার্থক্যটা ছোট নয়*

তাহলে যারা এখন পড়াশোনা করছে, কিংবা ডিগ্রি নিয়ে চাকরি খুঁজছে, তারা কী করতে পারে? আমার মনে হয়, নিজের সামর্থ্য প্রমাণ করতে প্রথমেই বড় কোনো প্রতিষ্ঠানে চাকরি পাওয়া জরুরি নয়। ছোট পরিসরেও শুরু করা যায়। হিসাববিজ্ঞানের ছাত্র হলে পাড়ার ছোট দোকানির হিসাব গুছিয়ে দেওয়ার সহজ কোনো পদ্ধতি তৈরি করো। সাংবাদিকতার ছাত্র হলে এআইয়ের বানানো খবর যাচাই করে দেখাও, কোথায় ভুল। কম্পিউটারবিজ্ঞান পড়লে এমন কিছু বানাও, যা গ্রামের একজন কৃষক কিংবা প্রতিবন্ধী একজন মানুষের সত্যিকার কাজে লাগে। শুধু বানালেই হবে না। যাঁদের জন্য বানাচ্ছ, তাঁদের হাতে দাও। তাঁরা ব্যবহার করতে পারছেন কি না, তা জানতে চাও। ভুল হলে আবার ঠিক করো। তারপর নিজের কাজের প্রমাণসহ একটা পোর্টফোলিও তৈরি করো। প্রতিটি উদ্যোগই চাকরি এনে দেবে না। কিন্তু পরের সাক্ষাৎকারে শুধু ‘আমি পারি’ বলার বদলে ‘এই যে, আমি করে দেখিয়েছি’ বলতে পারবে। এই পার্থক্যটা ছোট নয়।

তার মানে অবশ্য এই নয় যে ডিগ্রির আর প্রয়োজন নেই। ভিত শক্ত না হলে এআইয়ের ভুলগুলো আমরা ধরব কী দিয়ে? বিশ্ববিদ্যালয়ে শেখা মৌলিক জ্ঞানই আমাদের নতুন প্রযুক্তিকে যাচাই করতে, প্রশ্ন করতে এবং প্রয়োজনে সংশোধন করতে সাহায্য করে।

তবে এত কথা বলার পর আবার যেন সব দায় তরুণদের ঘাড়েই না পড়ে। বিশ্ববিদ্যালয়, সরকার আর নিয়োগদাতাদেরও দায়িত্ব আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমকে বাস্তব সমস্যার সঙ্গে আরও ভালোভাবে যুক্ত করতে হবে। প্রযুক্তি আর কর্মক্ষেত্র বদলাচ্ছে, কিন্তু শিক্ষার্থীরা যা শিখছে, তার সঙ্গে বাস্তব কাজের দূরত্ব কতটা কমছে? নিয়োগদাতাদেরও নতুনদের জন্য শিক্ষানবিশির সুযোগ বাড়াতে হবে। সবাই অভিজ্ঞ কর্মী চাইলে নতুনেরা অভিজ্ঞতা অর্জন করবে কোথায়? আর সুযোগগুলো শুধু ঢাকায় সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে না। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ভালো ইন্টারনেট, প্রশিক্ষণ আর কাজের সুযোগ পৌঁছাতে হবে। প্রযুক্তির সুবিধা যদি কেবল শহরের কিছু মানুষের মধ্যে সীমিত থাকে, তাহলে বৈষম্য আরও বাড়বে।

পরিবার আর সমাজের কাছেও একটা অনুরোধ। কাউকে তার প্রথম চাকরি বা বেকারত্ব দিয়ে বিচার করবেন না। তরুণদের উপদেশ যেমন দরকার, তেমনি দরকার একটু ভরসা, একটু সুযোগ। প্রতিদিন ‘চাকরি হলো?’ জিজ্ঞাসা করার চেয়ে কখনো হয়তো ‘কীভাবে সাহায্য করতে পারি?’ জিজ্ঞাসা করাটা বেশি কাজে আসে।

পিৎজার দোকানে কাজ করার সময় আমার জানা ছিল না, একদিন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াব, গবেষণা করব। তখন আমার সামনে কী আছে, সেটাই বুঝতে পারছিলাম না। আমার জীবন যেভাবে এগিয়েছে, সবার জীবন সেভাবে এগোবে, এমন কথা বলছি না। কারও পথ অনেক বেশি কঠিন। কারও হয়তো আমার মতো আবার পড়াশোনা শুরু করারও সুযোগ নেই। তাই ‘শুধু লেগে থাকলেই সব ঠিক হয়ে যাবে’—এমন ফাঁপা আশ্বাস দিতে চাই না। তবে এটুকু বলতে পারি, আজ তুমি যে অবস্থায় আছ, সেটাই তোমার জীবনের শেষ অধ্যায় নয়। প্রয়োজনে পথ বদলাও, মানুষের সাহায্য নাও, আবার শেখো। একবার একভাবে চেষ্টা করে কাজ না হলে অন্যভাবে চেষ্টা করো।

জেন-জি বন্ধুরা, তোমাদের ডিগ্রি তোমাদের অর্জন। কিন্তু ডিগ্রিই তোমাদের পুরো পরিচয় নয়। আর চাকরি না পাওয়া কিংবা চাকরি পেতে বেগ পাওয়া তোমাদের যোগ্যতারও চূড়ান্ত বিচার নয়। একদিন পিৎজার দোকানে দাঁড়িয়ে আমিও ভেবেছিলাম, বুঝি সব শেষ। আজ পেছনে ফিরে বুঝি, সেই সময়টা শুধু একটি কঠিন অধ্যায় ছিল। আসল গল্পটাই ছিল বাকি।

তোমাদের গল্প তো সবে শুরু।

* **এহসান হক**: অধ্যাপক, কম্পিউটারবিজ্ঞান বিভাগ, ইউনিভার্সিটি অব রচেস্টার, যুক্তরাষ্ট্র

Original: https://www.prothomalo.com/bangladesh/rxj0hn33tl
Text saved from the publisher's page in November 2026 so the piece stays available if the link changes. Copyright remains with the publisher.